কনে দেখা - ২

শুজা রশীদ

(কনে দেখা ১ যারা পড়েছেন, এই গল্প তার আগের।)

১৯৯৬। আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস স্টেটের একটি ছোট শহর মার্লবোরোতে অবস্থিত ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টে কাজ করি। ওয়ার্ক ভিসা। কপালের লিখন কাকে বলে। আমেরিকার মটর ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্র মিশিগানের ডেট্রয়েটের নিকটস্থ ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স শেষ করে সেখানে কোথাও কাজ না নিয়ে চলে যাই প্রথমে নিউ হ্যাম্পশায়ারের নসুয়াতে। পরে মার্লবোতে ফাইনানসিয়াল কম্পানী ফিডেলিটিতে যোগ দেই। কন্ট্রাক্ট কাজ। শুরু তিন মাস দিয়ে। প্রতি তিন মাসে রিনিউ হয়। হোক। কোন সমস্যা নেই। হাত পা ছাড়া, একা মানুষ। একটা কাজ গেলে আরেকটা হবে, যেখানে যেতে হয় যাওয়া যাবে, আমরা কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।

আমরা বলতে দুনিয়ার ভারতীয় পোলাপাইন। যেখানে যাই সবখানেই তাদের জমজমাট উপস্থিতি। ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে থাকতে আমার যাবতীয় বন্ধু ছিল ভারতীয়রাই, এবং কিছু হাতে গোনা পাকিস্থানী। তাদের সাথে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

মার্লবোরোতে আমার রুম মেট দুই জন। ধীরেন এবং শচীন। ধীরেন পাঞ্জাবী, চিকনা কাঠি, মোটা গলা, তাকে দেখলে মনে হয় এই বুঝি বাতাসের ঝাপটায় হুমড়ী খেয়ে পড়ে। শচীন ছোটখাট, দক্ষিনের, গাট্টাগোট্টা। দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি মার্লবোরোতে। আমি একটা কামরা দখল করেছি, তারা দুই ভারতীয় দেশী ভাই আরেক কামরায় ভাগাভাগি করে থাকে। বয়েসে আমি তাদের চেয়ে কিছু বড়, ত্রিশোর্ধ, তারা হয়ত মধ্য বিশ। কিন্তু তাতে আমাদের ভাবের কোন সমস্যা হয় না। সুখের সংসার, শুধু রমণীয় কোমলতার অভাব।

সেই ছোটবেলা থেকে ফুটবলের ভক্ত। কাজে একটি রাশিয়ান এবং আরেকটি ব্রিটিশ বংশদ্ভুত ছেলে পেয়ে গেলাম, দু' জনাই আমার চেয়ে পাঁচ সাত বছরের ছোট হবে কিন্তু ফুটবলে ভয়াবহ আগ্রহ। সপ্তাহে দুই দিন আমরা কাজের পর চলে যাই বোস্টনে, MIT র মাঠে রাতে ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে খুব সরগরম করে ফুটবল খেলা হয়। মাইল বাইশেক ড্রাইভ করে তিনজনে দল বেঁধে যাই, খেলা চলে রাত দশটা – এগারোটা পর্যন্ত, তারপর কাছেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে রাতের খাওয়া এবং আড্ডা চলে বারোটা - একটা পর্যন্ত। বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায়ই দুইটা

বেজে যায়। পরদিন সকালে উঠেই আবার কাজে ছোটো। কিন্তু তাতে সমস্যা হয় না। জীবন বেশ ভালোই কাটছে।

দেশ থেকে একদিন বাবার ফোন এলো। ফোনের ব্যবস্থা তখন এখনকার মত এতো ভালো নয়। যথেষ্ট খরচ। নিশ্চয় কোন একটা কারণ আছে। জরুরী কিছু। বাবা বেশী রাখ ঢাক করলেন না। আমি তাদের বড় ছেলে । আমার একটা গতি না করলে খুব শীঘ্রই পোতা পুত্নি দেখার কোন উপায় তাদের নেই। জানা গেল বোস্টনে একটি মেয়ে আছে, সে পড়াশোনা করছে, তার বড় ভাইয়ের সাথে থাকে। বড় ভাই আমার মতই এখানে কাজ করছে। তাদের সাথে একটু দেখা সাক্ষাৎ করলে এমন কি মন্দ হবে? তথাস্তু। পিতা মাতার অবাধ্য কখন হইনি। যেন তেমন কোন সমস্যায় না পড়তে হয় সেই ব্যাপারে এখানে আসা অবধি সতর্ক থেকেছি। মেয়েটির বড় ভাইয়ের ফোন নাম্বার পেলাম। বাবা বললেন ফোন করে নিজেই ব্যবস্থা করতে। এটাই আমার ঘটা করে প্রথম কন্যা দেখার অভিজ্ঞতা হবে। ভাবতেই রীতিমত ঘেমে উঠেছি। বরাবরই লাজুকতা ঘেঁষেই ছিলাম। বড়ই বিপদে পড়া গেল। কিন্তু মনের গভীরে সঙ্গীনির আকাংখ্যাও আছে। যা আছে কপালে, একদিন ফোন ঘুরিয়ে দিলাম। একটি পুরুষ কণ্ঠ ফোন ধরল। গলা শুনে মনে হল আমার বয়েসীই হবে। ভাই। আমি ফোন করতে পারি সে জানত। আলাপ ক্ষনস্থায়ী হল। পরের শনিবার রাতে MIT র ক্যাম্পাসের একটা রেস্টুরেন্টে আমাদের তিনজনের দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা শেষ হল।

খবর পেয়ে রুমমেট থেকে শুরু করে বন্ধূ বান্ধবরা সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। পুরো গ্রুপই অকর্মা। কারো একটা গার্লফ্রেন্ড নেই। যাদের আছে তারা আবার ভয়ে মেশে না। এক গোয়ালের গরু আরেক গোয়ালের গরুর সাথে কি মিল খায়। অকর্মার দল সবাই আমার সাথে যাবে বলে ঘোষনা দিল। কনে দেখে তাদের একটা মতামত দিতে হবে না। বুঝলাম বলাই ভুল হয়েছে। এই পঙ্গপাল নিয়ে গেলে দূর থেকে দেখেই পেছনের দরজা দিয়ে সটকে পড়বে। বাধ্য হয়ে তাদেরকে ভুলভাল একটা দিন-তারিখ দিয়ে নিরস্ত করলাম। ঠিক করলাম কোন একটা অজুহাত তুলে শনিবার সকালেই ফুটে যাব, পঙ্গপাল জানতেও পারবে না।

শনিবার আসতে নিরুপদ্রবেই সকেলের দৃষ্টির অগচোরে সটকে পড়া গেল। দেখা করার কথা বিকালে। বোস্টন আর কেমব্রিজে গিয়ে অকারনে MIT আর Harvard এ ঘোরাঘুরি করলাম। বিকালে গিয়ে হাজির হলাম নির্ধারিত স্থানে। এই ধরণের সাক্ষাতের সময় ঠিক কি করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে সম্পূর্ন অনভিজ্ঞ, তবুই বুদ্ধি করে এক তোড়া ফুল নিলাম। একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা নিশ্চয় ভালো দেখাবে না। ব্যাট শুরু করার আগেই আউট হতে হবে।

ভেবেছিলাম হয়ত আমাকেই গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সৌভাগ্যই বলতে হবে, রেস্টুরেন্টে ঢুকে মাত্র এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় মাঝারী উচ্চতার শ্যামলা বর্ণের একজন পুরুষ আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার বয়েস আমার মতই হবে। তার সঙ্গে কাউকে না দেখে আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, সে আমার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। "আপনি শুজা?"

থমকালাম। "জ্বি। আপনি?"

"মিজান।" হাত মেলালাম। আড় চোখে এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। কনেকে কোথাও দেখা যাচ্ছ না। রেস্টুরেন্টের ভেতরে কয়েকজন তরুণীকে দেখা গেল, তাদের মধ্যে কেউ হতে পারে। মিজান বলল, "চলুন বসি। চা কফি তো নিশ্চয় খাবেন।"

"নিশ্চয়। কিন্তু আমার treat।"

আমি মিজানকে অনুসরণ করে একটা টেবিলে তার উল্টো দিকে বসলাম। নাহ, উপস্থিত মেয়েদের কেউ তার সঙ্গীনি নয়। যার অর্থ, কনে হয়ত এখনও এসে পৌঁছায় নি। একটু অবাকই হলাম। ধারণা ছিল ভাই বোন একই সাথে থাকে। পৃথকভাবে আসবার কোন কারণ হয়ত আছে। হাতের ফুল নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করছি। টেবিলে আমার পাশে রাখলাম। কনে এলে তার হাতেই তুলে দিতে হবে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মিজানের দিকে কয়েকবার তাকিয়েও বিশেষ লাভ হল না। সে আমাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষন করে অর্ডার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওয়েট্রেস অর্ডার নিয়ে চলে যেতে কয়েকটা মুহুর্ত গেল নীরবে। "আপনি কোথায় কাজ করেন?" আমিই নীরবতা ভাঙি। বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল।

মিজান একটা ফার্মাসিউটিকাল কম্পানীতে I.T. তেই কাজ করে। তবে তার গ্রীন কার্ড হয়ে গেছে। আমার তখনও সেই পর্ব শুরুই হয় নি। কাজ শুরুই করেছি বছর খানেক। মিজানের প্রশ্নের উত্তরে সেই সব তথ্য ফাঁস করতে হল। গ্রীণ কার্ডের আবেদন করতে হয় কম্পানীর মাধ্যমে। আমি যে ভারতীয় কন্সাল্টিং কম্পানীর হয়ে ফিডেলিটিতে কাজ করি তারা আমার জন্য আবেদন করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। খরচ পাতি আছে, করার আগে তারা বুঝতে চায় প্রসেসিং হয়ে গেলেই ফুটে যাবো কিনা। হতে হতে বছর দুই তিন লেগে যায়।

চা এবং কফি এলো। মিজান কিছু নাস্তার অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু ক্ষুধা খুব একটা নেই। এই পর্যায়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মেয়ে দেখতে এসে শুধু ভাইকে দেখলে কি চলবে? গাধাটা কি বোনকে রেখেই চলে এলো! মিজান মনে হল এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করতেই রাজী নয়। সে রাজনীতি

নিয়ে আলাপ শুরু করল। "এই দেশে থাকাটাও তো সমস্যা। মানুষ জন এখনও অনেক বর্নবৈষম্যবাদী।"

লজ্জার মাথা খেয়ে আর বোনের আলাপ তুলতে পারলাম না। আপাতত আলাপ চালিয়ে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ধরে নিয়েছি কোন কারনে মেয়েটার আসতে হয়ত দেরী হবে। আমাকে এক বাক্যে সেটা একটু জানিয়ে দিলে দুশ্চিন্তা দূর হত কিন্তু সেই কথা এই বেওকুফ ভাইকে কে বোঝাবে। যাক সে কথা। বর্ণ বৈষম্য নিয়ে যখন আলাপ তুলেই ফেলেছে সেই সম্বন্ধে আমার একটা মূল্যবান মতামত না দিলে কেমন দেখায়। আমেরিকা পড়তে এসে অবধি একেবারে যে কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়িনি তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জনকেই ভালো মনে হয়েছে। ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর সাহায্য সহযোগীতা পেয়েছি। আমার ব্যাক্তিগতভাবে তেমন কোন অভিযোগ কখনই ছিল না। বরং একটা ধারণা ছিল অনেক মানুষ বিদেশের মাটিতে এসে এমন ভাব করে যেন এই দেশে এসে তারা একেবারে পানিতে পড়ে গেছে। আমার তেমন কোন অভিযোগ নেই। মনের কথাই বললাম। "বর্ণ বৈষম্যবাদ যে একেবারে নেই তা হয়ত নয়, কিন্তু বর্ণের চেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতাই বেশী গুরুত্বপূর্ন। যারা সংখ্যায় বেশি, স্বাভাবিকভাবেই তারা সমাজের সকল স্তরে বেশী প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাদের সামগ্রিক ক্ষমতা বেশী। সংখ্যা লঘুদের চেষ্টা করতে হবে ক্ষমতার সকল স্তরে পৌঁছে যেতে – পলিটিক্স, পুলিশ, আর্মি, কর্পোরেট টপ লেভেল – সব খানে থাকতে হবে প্রতিনিধিত্ব। তাহলেই একমাত্র সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করা যাবে। শুধু অভিযোগ করে কিছুই পাওয়া যায় না।"

মিজানকে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হল না। সে বলল, "আপনি যাই বলেন, আমার এই দেশে খুব বেশী দিন থাকার ইচ্ছা নয়। নিজের দেশ আর পরদেশ কি এক হল। গ্রীণ কার্ড হয়েছে তারপরও আমরা থাকব কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই।"

এই সেরেছে। ভাইয়ের যদি এই মত তাহলে বোনের তেমনটি হবার সম্ভাবনাই বেশী। একবার যদি দেখা পেতাম তাহলে না হয় দু' একটা কথা বলে বোঝার চেষ্টা করা যেত। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, "আপনার বোন কি পরে আসবেন?"

মনে হল এতক্ষনে তার খেয়াল হয়েছে। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "বলতে ভুলেই গেছি। হ্যাঁ, ওকে একটু ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয়েছে একটা কাজে। চলে আসবে। হয়ত আর দশ পনের মিনিট। তা আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি?"

এখানে অনেক কষ্ট -ফস্ট করে, বিস্তর কাজকর্ম করে পড়াশুনা শেষ করেছি। কাজ পাবার পর হাতে কিছু টাকা পয়সা এসেছে। এখন কয়টা দিন একটু ঘোরাফেরা করতে চাই, শরীর এলিয়ে থাকতে চাই। কিন্তু কনের ভাইয়ের কাছে এই কথা বলার অর্থ নিজেকে উদ্দেশ্যহীন অর্বাচীন

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। চাকরীর ইনটারভিউ দেবার মত খুব বড় বড় বাতচিত দিলাম – হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা – অনেক বড় বড় প্ল্যান। নিজের ব্যবসা শুরু করব। চাকরী করে কি আর বড়লোক হওয়া যায়?

মিজান মনে হল না খুব একটা পছন্দ করল। "ব্যাবসা আমাদের পছন্দ নয়। আমার এক চাচা ব্যাবসা করতে গিয়ে একেবারে ফকির হয়ে গেছে। এখন সে অন্যের কাছে টাকা চায় আর মেশা ভাং করে।"

কি সর্বনাশ! হেসে বললাম, "ব্যবসার মধ্যে আমিও নেই। আমার বাপ দাদা চৌদ্দ গুষ্টির মধ্যে কোন ব্যবসায়ী নেই। আমি দেব কন্সাল্টিং কম্পানী। এটা ঠিক ব্যবসা নয়। এটা হচ্ছে একদম একশ ভাগ লাভজনক। লোকসান হবার কোন উপায় নেই।"

মিজান গম্ভীর মুখে বলল, "আমার বন্ধুদের কয়েকজন চেষ্টা করেছিল। ধরা খেয়ে গেছে। এই রকম ভালো বাজারে যদি না চলে তাহলে মার্কেট যখন খারাপ হবে তখন আপনার কি অবস্থা হবে ভাবুন।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেলাম। "চিন্তার কোন কারনই নাই। চাকরীই করব। চাকরীর উপর কিছু আছে নাকি?"

"সারা জীবন চাকরীই করবেন? শুধু চাকরী করে কি আর বড় হওয়া যায়?" মিজানের দৃষ্টিতে আশংকা।

কি বিপদ! ব্যবসা করলেও সমস্যা, না করলেও সমস্যা। ঘড়ি দেখলাম। পনের মিনিট তো পার হয়ে গেছে। আবার বোনের কথা জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে? বেচারা কি ভাববে? আমি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলাম। ভাবছি নিজেই ধরতে পারবে। ফল হল উলটা। এবার মিজান নিজেই ঘড়ি দেখতে শুরু করল। ভাবলাম হয়ত বোনের দেরী দেখে সেও বিব্রত বোধ করছে। তাকে সহজ করবার জন্য বললাম, "হয়ত উনি কোথাও আটকে গেছেন। ফোন নিশ্চয় আছে। একটা ফোন করে দেখুন না।"

মিজান ম্লান হেসে বলল, "নাহ, এখনও যেহেতু আসে নি, তাহলে আজ আর আসতে পারবে না। আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বিপদে পড়লাম। ভাইজান কি বোনকে না দেখিয়েই কেটে পড়তে চাইছে? এতো ভারী অন্যায়। শেষ চেষ্টা করলাম। "এত দূর যখন এসেছি, আরেকটু অপেক্ষা করতে আমার কোন সমস্যা নেই।"

মিজান লজ্জিত মুখে বলল, "নাহ, আজ আর হবে না। আমি আপনাকে আরেক দিন ফোন দেব। চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা তো কাছাকাছিই থাকি।"

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে বিদায় নেবার সময় হাত মেলানো হল। আমার অন্য হাতে ফুলের তোড়াটা এখনও ধরা। ফেরত নিয়ে যাব? বললাম, "ভাই, এটা ওনার জন্য এনেছিলাম। তাকে যদি দয়া করে দিয়ে দিতেন..."

মিজান দ্বিধা করে নিল। কিছু বলল না। হন হন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। তার হাব-ভাব দেখেই বুঝলাম এই ফুল বাসা পর্যন্ত যাবে না। ধেত্তেরি! কনে দেখতে এসে কনের ভাইকে দেখেই ক্ষান্ত থাকতে হবে এই রকমটা কে আশা করে?

রাতে বাবাকে ফোনে বলতে বাবা হা হা করে হাসলেন। "ভাই মনে হয় তোকে আগে দেখে গেল। পছন্দ হলে তারপর মেয়ের সাক্ষাৎ পাবি।"

কিছুদিন অপেক্ষা করে ছিলাম। সেই ডাক আর আসে নি। চুলোয় যাক।